নিষেধের বেড়াজালে বন্দি নারী

মামুন অর রশিদ

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী অন্য দশজন স্বাভাবিক মানুষের মতো নয়, যেন এক অন্য বস্তু। পরিবার ও সমাজে তাকে নানারকম নিষেধের বেড়াজালে আটকে থাকতে হয়। আটকে থাকতে না চাইলে লড়াই করে বাইরে আসতে হয়।

মধ্যযুগে বিভিন্ন দেশের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে মেয়ে তথা কন্যাসন্তান জন্ম হওয়াকে পাপ মনে করা হতো। কন্যাশিশুকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। একবিংশ শতাব্দীতে এসেও এই পরিস্থিতি পুরোপুরি পালটায় নি। ভারতীয় উপমহাদেশে, বিশেষত বাংলাদেশ এবং ভারতে এখনো হরহামেশা এই ঘটনা ঘটে চলেছে। তবে ধরন পালটেছে। আগে গর্ভের সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে তা জানা যেত না। তাই সন্তানের লিঙ্গ সম্পর্কে জানতে প্রসবের অপেক্ষা করতে হতো। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে গর্ভের সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ করা যায় বলে মেয়েসন্তানের জন্ম সম্ভাবনা নষ্ট করে দেওয়া হয় ভ্রূণহত্যার মাধ্যমে। ভারতে এ ধরনের ঘটনার প্রাদুর্ভাব থাকায় সেখানে জন্মের পূর্বে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ নিষিদ্ধ করে 'প্রি-কনসেপশান অ্যান্ড প্রি-ন্যাটাল ডায়াগনস্টিক অ্যাক্ট (প্রহিভিশান অফ সেক্স সিলেকশান) ১৯৯৪ নামে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এমনকি, এই পদক্ষেপ ঠেকাতে কোনো কোনো রাজ্য সরকার কন্যাসন্তানের জন্ম হলে বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থাও রয়েছে বলে জানা যায়।

আমাদের দেশে নারী-পুরুষে বিভাজন করা ছোট্টবেলায়ই শিখিয়ে দেওয়া হয়। তুমি মেয়ে, তোমাকে আস্তে কথা বলা শিখতে হবে। বেশি জোরে হাসাহাসি করা যাবে না। দৌড়ানো যাবে না। সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করা যাবে না। কন্যাশিশুর প্রতি এই যে নিষেধাজ্ঞা বাচ্চা বয়স থেকে আরোপিত হতে শুরু করে তা বিভিন্ন আঙ্গিকে বার্ধক্যে তাদের মৃত্যু পর্যন্ত ক্রিয়াশীল থাকে। তাদের জীবন আবর্তিত হয় বিভিন্ন ধরনের নিষেধের বেড়াজালের মধ্যেই।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষে সমতা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করেছে। কিন্তু প্রায় অর্ধশতক বয়সী বাংলাদেশে আজো পরিবার থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত সর্বত্রই লিঙ্গভিত্তিক অসমতা টিকে আছে।

সংবিধানের ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদের বলা হয়েছে :

(১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।

(২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।

২৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :

সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

অনুচ্ছেদ ২৮-এ বলা হয়েছে :

(১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

এ ছাড়াও, সংবিধানের ২৯ অনুচ্ছেদে আছে :

(১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

সংবিধানে এ ধরনের অঙ্গীকার আরো আছে, যা নারী-পুরুষ সমতার মূলমন্ত্রকে সামনে নিয়ে আসে। কিন্তু এখানে আমরা উদাহরণ আর বাড়াব না। আমরা বলতে চাই যে, সংবিধানে এতসব অঙ্গীকার সত্ত্বেও আমাদের সমাজ-রাষ্ট্রে এ সংক্রান্ত যথাযথ প্রতিফলন নেই। যে কারণে আমাদের নারীদের সামগ্রিক অবস্থা ও অবস্থান কোনোভাবেই পুরুষের সমপর্যায়ে নেই।

নারী-পুরুষের সমতা প্রশ্নে সংবিধানের অঙ্গীকার অনেক ব্যাপ্ত। কিন্তু আমরা যদি সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রবেশাধিকারের প্রশ্নেও কেবল চোখ রাখি, দেখব যে সেক্ষেত্রেও আমরা ব্যর্থ হয়েছি। কেবল লিঙ্গ পরিচয়ের কারণে অর্থাৎ কেবল নারী বলে এখনো অনেক জায়গায় তাদের প্রবেশাধিকার নেই। আর এই কাজে অস্ত্র হিসেবে নারীর কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয় নানা ধরনের ট্যাবু তথা অলঙ্ঘনীয় নিষেধাজ্ঞা, যা মানুষ টপকাতে পারে না কুসংস্কারাচ্ছন্নতার কারণে।

এমন নয় যে, সমাজের সকল স্তরে সকল মানুষের মধ্যেই এসব সমানভাবে ক্রিয়াশীল। আমাদের সমাজের একাংশ মানুষের মধ্যে এখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী-পুরুষে অনেকটাই সমতার চর্চা হয়। তবে এই অংশ মানুষ সংখ্যায় এতই অপ্রতুল যে, অসমতাপূর্ণ সমাজচিত্রটিকেই এখনো আমাদের সমাজের সাধারণ চিত্র বলে ধরা যায়। এই বিবেচনায়ই কিছু ট্যাবু ও কুসংস্কার এখানে তুলে ধরা হলো, যেগুলো নারীর জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যকে নষ্ট করে দেয়, বঞ্চিত করে এবং সর্বোপরি নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রাখে।

১.

পরিবারে ছেলেমেয়েদের খাওয়ার সময় মাছের মাথাটা তুলে দেওয়া হয় ছেলের প্লেটে। কারণ বাপের বাড়িতে মেয়েদের মাছের মাথা খেতে নেই। ভাবা হয়, শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে তো মেয়েরা মাথা খেতে পারবেই। এবার মেয়েটির বিয়ে হলো। এখন মেয়েকে নিজের হাতে মাছের মাথা তুলে দিতে হয় শ্বশুর বা স্বামীর প্লেটে। সন্তানাদি হলে এবার শুরু হয় তাদের লালনপালনের পালা। তখন মাথাটা তুলে দিতে হয় ছেলেসন্তানের পাতে। অর্থাৎ, নারীর আর মাছের মাথা খাওয়া হয় না।

২.

এটি এখনো অনেক পরিবারে অমোঘ নিয়ম হিসেবে মেনে চলা হয় যে, বাড়ির সবার খাওয়াদাওয়া শেষ করার পর নারীদের খেতে হবে। নারী-পুরুষ এক সাথে খেতে নেই। স্বামী যত দেরি করেই ফিরুক না কেন, স্ত্রীকে না খেয়ে অপেক্ষা করতে হবে। স্বামীর পাশে বসে তাকে বাতাস করতে হবে। ভালো ভালো সব খাবার বাড়ির কর্তাদের প্লেটে উঠিয়ে দিয়ে শেষ বেলায় হাঁড়ির তলায় যা থাকবে তাকে সেটাই খেতে হবে। এভাবে অনুৎকৃষ্ট মানের অল্প খাবার খেয়েই অনেক নারীর জীবন পার করে দিতে হয়।

৩.

মেয়ে হলে তাদের খেলার উপকরণ হবে পুতুল, হাঁড়ি-কুড়ি, থালা-বাটি ইত্যাদি। আর ছেলে হলে তাদের খেলার উপকরণ হবে ব্যাট, বল, লাটিম, খেলনা পিস্তল, ঘুড়ি, গাড়ি ইত্যাদি। ছেলেদের কিনে দেওয়া হয় বাইসাইকেল, তারা সারাদিন সেটা চালিয়ে বেড়াতে পারে। কিন্তু মেয়েকে সাইকেল কিনে দেওয়া তো দূরের কথা, অনেক পরিবারের মেয়েদের সাইকেল চালানো শিখতেই দেওয়া হয় না। কোনো মেয়ে যদি সেটা করে তাহলে সে অবাধ্য মেয়ে হিসেবে চিহ্নিত হয়, সমাজ তাকে আড়চোখে দেখে।

৪.

বিয়ের পাত্রী হিসেবে মেয়েকে অবশ্যই ফর্সা হতে হবে। খাটো বা বেঁটে হওয়া চলবে না। মেয়ের কোনো ধরনের কোনো খুঁত থাকা চলবে না। বিপরীতে ছেলের হাজারো খুঁত থাকলেও তাতে কোনো সমস্যা নেই। শুধু মেয়েদের বেলায় যত নিয়মকানুন। ছেলে কালো হলে বাবার কোনো চিন্তা নেই। কিন্তু যদি একটি মেয়ের গায়ের রং কালো হয়, তাহলে সেজন্য দুশ্চিন্তার কোনো অন্ত থাকে না। কালো মেয়ের বিয়ের সময় ছেলের বাড়ি থেকে একগাদা পণ (যৌতুক) দাবি করা হয়, যেন কালো হওয়াটাই আজন্ম পাপ। এ ছাড়া, কোনোভাবে যদি একবার কোনো অপবাদ গায়ে লেগে যায়, তাহলে ওই কন্যা সম্প্রদান করতে গিয়ে পরিবারকে নিঃস্ব হয়ে যেতে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে কারো স্বামী মারা গেলে, সমাজ তাকে অন্য চোখে দেখতে শুরু করে। তাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে দিতে গেলে নানারকম ঝামেলা পোহাতে হয়। মেয়ের ডিভোর্স হলে শুরু হয় নানা গঞ্জনা। কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে পুরো উলটো ব্যাপার। বরং দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে বসলে তার আরো পোয়াবারো হয়।

৫.

সতীত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে হিন্দু সমাজে একসময় স্ত্রীকেও স্বামীর চিতার আগুনে পুড়ে সহমরণে যেতে হতো। আজ সহমরণে যাবার সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে বটে, কিন্তু সতীত্ব ধারণা আমাদের সমাজ থেকে বিলুপ্ত

হয় নি। এই সতীত্ব ধারণা কেবল নারীদের বেলায় প্রযোজ্য, যে শব্দের পুরুষবাচক কোনো প্রতিশব্দই নেই, যেজন্য ছেলে বা পুরুষের সতীত্ব নিয়ে সমাজে কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

৬.

গ্রাম্য বিচার-সালিশে সব সময়ই মেয়েপক্ষের বা নারীদের একটু বেশি দোষ বা অপবাদ দেওয়া হয়। ছেলে বা পুরুষ দোষ করলেও তার দোষকে ছোট ও স্বাভাবিকভাবে দেখা হয়। কাজেই অপবাদ বা নিন্দা যেটুকু নেবার সবটা মেয়েকেই নিতে হয়।

ভারতীয় উপমহাদেশে বিশেষত পাকিস্তানে আজো রয়েছে 'অনার কিলিং'-এর মতো বর্বর ও অমানবিক প্রথা, যেখানে পরিবারের সম্মান রক্ষার্থে মেয়েকে হত্যা করা। এই বর্বরতাকে সেখানকার সমাজ আজো মর্যাদার সাথে গ্রহণ করে।

৭.

বাবা-মায়ের নির্দেশ থাকে সন্ধ্যার আগেই মেয়েকে ঘরে ফিরতে হবে। সন্ধ্যার পর আর বাইরে বের হওয়া যাবে না। কিন্তু ছেলেদের বেলায় এ সংক্রান্ত কোনো কড়াকড়ি নেই। ভাবা হয়, ছেলেমানুষ একটু-আধটু বাইরে তো যাবেই। কাজেই ছেলে সন্ধ্যার পর বের হলে বা রাত করে বাসায় ফিরলেও তেমন জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হতে হয় না।

একইভাবে মেয়েদের বাজারঘাটেও যেতে নেই। বাজারঘাট ছেলেদের কাজ। যদি কোনো মেয়ে বাজারে যায়, সমাজ তাকে বাজারি মেয়ের সিল লাগিয়ে দেয়। বেছে বেছে ভালো স্কুলটাতেই ছেলেকে পাঠানো হয়। আর বাড়ির কাছের নড়বড়ে স্কুলে পাঠানো হয় মেয়েটাকে। কারণ মেয়েকে অত ভালো স্কুলে পড়িয়ে লাভ কী! দু'দিন পর বিয়ে দিয়ে পরের বাড়িতেই তো পাঠিয়ে দিতে হবে।

৮.

পারিবারিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সব সময়ই পুরুষদের প্রাধান্য থাকে, যেন সিদ্ধান্তটি বাড়ির পুরুষকর্তার কাছ থেকেই আসতে হবে। ছেলেমেয়েদের কোন স্কুলে ভর্তি করা হবে, আজ বাড়িতে কী রান্না হবে, বাড়িতে কয়টি গৃহশিক্ষক থাকবে, বাড়ির ভবন কয় তলা হবে, ভবনের রং কী হবে, কোথায় কোন পাত্র-পাত্রীর সাথে ছেলেমেয়ের বিয়ে দেওয়া হবে, এরকম আরো নানা সিদ্ধান্ত আসে বাড়ির কর্তা তথা পুরুষের কাছ থেকে। এসব ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা হতে হয় সমর্থকের। তাকে যেখানে যেভাবে খুশি রাখা যায়, তার কোনো প্রতিবাদ করা প্রায় চলে না। অথচ নারীকে বলা হয় অর্ধাঙ্গী। অর্থাৎ পুরুষের অর্ধেক। নারীদের নিয়ে কবি-সাহিত্যিকগণ রচনা করেছেন অমর সব কবিতা, গল্প, উপন্যাস, গানসহ নানা কিছু। কিন্তু বাস্তব জীবনে কালজয়ী সাহিত্যে নারীর অবস্থানের স্বীকৃতি মেলে না। তাকে প্রায়ই দেওয়া হয় না সমান মর্যাদার আসন।

৯.

মেয়ে তথা নারীদের কোনো বাড়ি নেই। তারা যখন বাপের বাড়িতে থাকে, তখন তাকে বলা হয় এটা তোমার বাপের বাড়ি। তোমার নিজের বাড়ি হলো তোমার স্বামীর বাড়ি। অর্থাৎ বিয়ের পর তোমার আসল

বাড়ির ঠিকানা খুঁজে পাবে। মেয়ে যখন শ্বশুরবাড়ি যায়, তখন বলা হয় এটা তোমার ঘর নয় বরং তোমার স্বামীর ঘর। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনোরকম ভুল বোঝাবুঝি হলে কথায় কথায় স্বামী তাকে তার বাপের বাড়ি চলে যেতে বলে। আসলে নারীর নিজের কোনো ঘরবাড়ি নেই। অনেক সমাজে আজো এটাই নারীর অবস্থা।

১০.

বিয়ের প্রথম রাত থেকেই মেয়েদের মুরব্বিরা জানিয়ে দেন, আজ থেকে তুমি চলবে তোমার স্বামীর নির্দেশমতো। কীভাবে সবার সাথে মিশবে, কীভাবে অন্যদের সাথে কথা বলবে সেটা স্বামীই নির্ধারণ করবেন। এর হেরফের হলে মেয়ের নানারকম গঞ্জনা শুনতে হয়। বলা হয়, বাপের বাড়িতে মেয়ে কোনো আদবকায়দা শেখে নি। বাচ্চা-কাচ্চা কয়টা নেবে, কখন নেবে, সেটাও স্বামীর কথামতো হতে হবে। স্ত্রীরও যে চাওয়া-পাওয়া আছে বা থাকতে পারে, সেটা মাথায়ই থাকে না। এসব ক্ষেত্রে অধিকারের প্রশ্ন তো সামনে আনাই হয় না।

১১.

আমাদের সমাজে যদি কোনো দম্পতির ছেলেমেয়ে না হয়, তাহলে সব দোষ গিয়ে পড়ে নারীর ঘাড়ে। কোনোরূপ পরীক্ষানিরীক্ষা ছাড়াই ভাবা হয়, নিশ্চয়ই মেয়েটির কোনো সমস্যা আছে। তখন সে চিহ্নিত হয় অলক্ষ্মী, অপয়া, বন্ধ্যা হিসেবে। সমাজে তাকে বাঁকা চোখে দেখা শুরু করে। কখনো কখনো স্বামী মেয়েটিকেই ডাক্তার-কবিরাজের কাছে নিয়ে যায়। কিন্তু স্বামীরও যে সমস্যা থাকতে পারে, তার সমস্যার কারণেও যে ছেলেমেয়ে না হতে পারে, সে ব্যাপারটাকে সেভাবে আমলেই নেওয়া হয় না। সমাজে সে বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়ালেও পাড়া-পড়শিদের কাছ থেকে কোনো গঞ্জনা শুনতে হয় না। কখনো কখনো সন্তানলাভের আশায় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দ্বিতীয় বিয়েও করেন অনেকে।

১২.

কোনো দম্পতির মেয়েসন্তান জন্মালে তাকে মায়ের দোষ হিসেবে দেখা হয়। অথচ চিকিৎসাবিজ্ঞান মতে, ছেলেসন্তান হবার জন্য যে ক্রোমোজম দরকার হয়, সেটা আসে বাপের কাছ থেকে। অথচ এই ভিত্তিহীন অভিযোগেও অনেক সময় স্ত্রীকে নির্যাতন করা হয়, তালাক দেওয়া হয়। সম্প্রতি ভারতের উত্তর প্রদেশে এক নারী ক্রীড়াবিদ কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ায় তাকে তালাক দিয়েছেন তার স্বামী। ওই নারীর নাম শুমায়লা জাভেদ, যিনি কিনা ভারতে নেটবলে সাতবারের চ্যাম্পিয়ন।

১৩.

পথে-ঘাটে, বাজার-কমপ্লেক্স বা শপিংমলে কোনো নারী যৌন হয়রানির শিকার বা শারীরিকভাবে লাঞ্ছনার শিকার হলে দোষ চলে যায় নারীটির ঘাড়ে। বলা হয়, তার বেমানান পোশাকের জন্যই এসব ঘটেছে। প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটলে দেখা যায়, সব দোষই ছিল প্রেমিকার। তার জন্যই বিচ্ছেদের রাগিণী বেজে উঠেছে। প্রেমিকটি নিষ্পাপ, নিরাপরাধ।

আমাদের সমাজ-রাষ্ট্র আজ অনেকখানি বদলে গেছে। পুরুষ যে ধরনের কাজ করে, নারীও আজ সে ধরনের কাজে যুক্ত হয়েছে ও হচ্ছে। নারী-পুরুষের মিলিত উৎপাদনে আজ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক উন্নত

হয়েছে। বেড়েছে আমাদের শিক্ষার হারও। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে শিক্ষাবঞ্চিত মানুষের মতো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত একাংশ মানুষের মধ্যেও উপরে উল্লিখিত কুসংস্কারের চর্চা টিকে আছে, যা নারী-পুরুষে বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখতে ভূমিকা রাখছে।

নারী-পুরুষে বৈষম্য সমাজ-রাষ্ট্রের প্রশ্রয়েই টিকে থাকে। সমাজ-রাষ্ট্রই পারে এমন অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে। তবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এক্ষেত্রে পুরুষের দায়-দায়িত্বই বেশি। জীর্ণ সব কুসংস্কারের জাল ছিন্ন করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ তাদের ক্ষেত্রেই প্রত্যাশিত।

প্রথমত, বাংলাদেশের সংবিধান যে নারীকে সমান অধিকার দিয়েছে, দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের সমাজের কিছু নারী-পুরুষ এখনো সে তথ্য জানে না বা জানলেও তা মানে না বা চর্চা করে না। সরকারের পাশাপাশি আমাদের সবার দায়িত্ব রয়েছে এই তথ্য সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করা।

দ্বিতীয়ত, অশিক্ষিত মানুষকে নিয়ে গড়ে ওঠা সমাজ কুসংস্কারমুক্ত হতে পারে না। শিক্ষার আলোই পারে জীর্ণ কুসংস্কার দূর করতে। বর্তমানে আমাদের দেশের শিক্ষার হার অনেক বেড়েছে। কিন্তু এরপরও এখানে কুসংস্কারের চর্চা টিকে থাকা এটা বোঝায় যে, তথাকথিত অনেক শিক্ষিত লোকই প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করে উঠতে পারে নি, যে কারণে তাদের মনের অন্ধকারও দূর হয় নি। কাজেই রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন পর্যায়ে এমন শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে, যা হবে যুক্তিনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানসম্মত।

তৃতীয়ত, হাজার হাজার বছর ধরে লালিতপালিত হয়ে আসা পুরুষতান্ত্রিক মন-মানসিকতা আমাদের মধ্যে এখনো বদ্ধমূল হয়ে আছে। সমতাপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলতে হলে এর পরিবর্তন ঘটাতে হবে। এই কাজটা করতে হবে ব্যক্তি পর্যায়েই। কারণ ব্যক্তি নিজে তার মন-মানসিকতা বদলাতে উদ্যোগী না হলে বাইরে থেকে তা পরিবর্তন করা যায় না।

বেগম রোকেয়া বলেছিলেন, 'দ্বিচক্র-যানের একটি শকট বড়, আরেকটি ছোট হলে সেটি ঠিকভাবে চলতে পারে না।' তেমনিভাবে নারী-পুরুষে অসমতা থাকলে সমাজের বিকাশ, উন্নয়ন ঘটতে পারে না। নারী-পুরুষে সমতা না থাকলে সমাজ অসমতল দ্বিচক্রযানের মতো চলতে থাকবে। রাষ্ট্র-সমাজকে এই অসমতা দূরীকরণে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে। তবেই প্রতিষ্ঠিত হবে একটি সমৃদ্ধশালী ন্যায়ানুগ সমাজ।

মামুন অর রশিদ প্রভাষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
Mamun.Rashid20@gmail.com